ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 10. Number 02. March 2014

মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা : একটি পর্যালোচনা

ড. মো. একরাম হোসেন*

Abstract : Within the Muslim society, Khanbahadur Ahsanullah is one of the most important contributors who have the special contribution to the expansion of modern education. Fuller Hostel in Rajshahi Govt. College, Karmichel Hostel, Taler Hostel, Muslim Institute in Calcutta and particularly Dhaka University are the shining examples of his contribution. He has a great fascination for modern western education. In this article an attempt has been made to evaluate Khanbahadur Ahsanullah's contribution to Modern education of twentieth century Muslim society.

ভূমিকা

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা ১৮৭৩ সালে সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ থানার নলতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি নিজ গ্রামেই মৃত্যুবরণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৫ সালে তিনি দর্শনে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। সে সময় বাঙালি মুসলিম সমাজে দর্শন প্রায় নিষিদ্ধ বিষয় ছিল। দর্শন পড়লে মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে আসে ইত্যাদি কতগুলো সংস্কার মুসলিম সমাজের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল। দর্শন পড়েও খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার বিশ্বাস দুর্বল হয়নি। স্রষ্টার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রবল। সৃষ্টির সেবাকে তিনি স্রষ্টার ইবাদত মনে করতেন। তাঁর দর্শনের মূলমন্ত্র হলো, 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা।'[১] স্কুলের শিক্ষকতা দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। চাকরির চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের এ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর। এর আগে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এই পদে কেউ অধিষ্ঠিত হয়নি। চাকরি জীবন শেষে কলকাতার অভিজাত এলাকায় বসবাস এবং পুস্তক ব্যবসার জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়িক জীবন তাঁর দীর্ঘ হয়নি। পরে তিনি কলকাতার ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে নলতায় চলে আসেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নলতাতেই ছিলেন। বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য, শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান, টীচারস্ ম্যানুয়েল, সৃষ্টিতত্ত্ব, ছুফী'সহ তিনি ৮১টি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া রয়েছে তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্র। সবই তাঁর মৌলিক রচনা।

শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষানীতি

বর্তমান আমরা যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি– তা মানুষের ক্রমাগত শিক্ষারই ফলশ্রুতি। শিক্ষার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি-সমাজ-সভ্যতা ক্রমাগত এগিয়ে চলছে। শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীদের দ্বারা সংস্কার লাভ করছে। মুসলিম সমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

গড়ে তুলতে যে ক'জন বাঙালির অবদান রয়েছে, তাঁদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা অন্যতম। শিক্ষা কী, শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী, আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারে কিনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। অনগ্রসর মুসলিম জাতির উন্নতির জন্য কাজ করেছেন প্রচুর। তৎকালীন সময়ে মুসলিমদের শিক্ষার সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। আবার যতটুকু ছিল তাতে মুসলিমদের আগ্রহ ছিল না, যার কারণে শিক্ষা থেকে তাদের দূরে সরে পড়তে হয়। এ প্রসঙ্গে ড. আনোয়ারুল করীম বলেন-

> ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের অসহযোগিতার কারণে হিন্দুরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়। ফলে চাকুরী এবং সমাজ জীবনে ইংরেজদের সহযোগিতায় তাঁরা মর্যাদার আসনে উন্নীত হয়। দেশের সকল কর্মকাণ্ডে হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। অপরদিকে মুসলমানেরা ধর্মীয় অভিমান হেতু ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ না করে হিন্দুদের অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। সমাজ জীবনেও তারা হিন্দুদের ঈর্ষা ও ঘৃণার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। মুসলমানদেরকে মনে করা হতো অস্পৃশ্য যবন। কোনো মুসলমান শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হলে তাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হতো।[২]

এ থেকে লক্ষ্য করা যায় তৎকালীন মুসলিম সমাজ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় কালাতিপাত করত। তবে "রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পূর্বে মিশনারীদের সহায়তায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দীর্ঘ সময় (১৬০০-১৭৬৫) বাংলায় বেশ কয়েকটি চ্যারিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে এদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মান্তকরণে কাজ করতে থাকে।"[৩] ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলিমদের খুশী করার জন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য ধর্মভিত্তিক শিক্ষার পথই প্রথমে বেছে নেয়। ফলে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা সমালোচিতও হয়। গবেষক ও শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ হান্নান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বলেন–

> ব্রিটিশ ভারতে ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং এর দশ বছর পর ১৭৯১ সালে জোনাথান ডানকান কর্তৃক কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর জন্যে ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। দ্রুত জেগে ওঠা ভারতীয় ছাত্র সমাজকে ধর্মান্ধতায় সুপ্ত রাখা এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা একে পরিচিত না করাই ছিল তাদের মৌল উদ্দেশ্য।[৪]

ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা পরবর্তীতে শিক্ষানীতির পরিবর্তন ঘটান; তবে এই পরিবর্তন তাদের নিজেদের স্বার্থেই। স্বজাতির উন্নতির জন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা সেকালের সমাজ সচেতন শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় এগিয়ে এসেছিলেন। বহু স্কুল, মক্তব-মাদ্রাসা, ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং সেগুলোতে ছাত্র, শিক্ষক, পরিচালক, ছাত্রবৃত্তি ও পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন এনে তাঁর ধ্যান-ধারণার বাস্তব রূপায়ণ করেছিলেন। মুসলিম সমাজ যখন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, শিক্ষা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে; তখন তিনি শিক্ষা সংস্করণে অগ্রসর হন। সৈয়দ মূর্তাজা আলী বলেন, "মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন।"[৫] আহ্ছানউলণ্ঢা মুসলিম সমাজকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ড. আনোয়ারুল করীম বলেন, "খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং চাকুরী ক্ষেত্রে তাদের উপযোগী করে তোলা।"[৬] তবে তিনি ইংরেজি শিক্ষাকেই নিরঙ্কুশভাবে সমর্থন করেননি; ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতি ছিলেন।

তৎকালীন বঙ্গদেশে সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৫৩.৯ জন মুসলিম অথচ শিক্ষিত মুসলিমদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪.৫ জন মাত্র। শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে মুসলিম ছাত্র-শিক্ষকদের কোনোঠাসা করা হয়েছিল। এই গণনার ক্ষেত্রে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকেও গণ্য করা হয়েছিল। খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা বলেন, "...যাহাদের বর্ণজ্ঞান মাত্র আছে তাহাদিগকেও শিক্ষিত পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রকার ঘোরতর মূর্খতা এক তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গদেশ ব্যতীত সভ্য জগতের অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।"[৭] ভারতবর্ষে তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার নানা ত্রুটি খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢাকে ভাবিয়েছিল। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে একদেশদর্শী নীতি কোনভাবে মানতে পারেননি। শিক্ষাযন্ত্র কখনও একদেশদর্শী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এটি এমনভাবে পরিচালিত করা প্রয়োজন যাতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষ জ্ঞানের আলো লাভ করতে পারে। তিনি বলেন, "...পারিপার্শ্বিক অবস্থা এরূপ গঠন করিয়া তুলিতে হইবে যেন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে শিক্ষাবিস্তার লাভ করিতে পারে।"[৮] শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই সমভাবে উপকৃত হবে- কিন্তু তৎকালীন সমাজে এরূপ চিত্র পরিলক্ষিত হয় নি। ড. গোলাম মঈনউদ্দিন বলেন, "ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে মুসলমানদের যে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গির যে পশ্চাৎপদতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অবক্ষয় তাকে নতুন জীবনদৃষ্টি ও বিশ্বদীক্ষা নির্মাণে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন।"[৯] তবে কেউ কেউ আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণ হিসেবে দারিদ্রতা ও মোলণ্ঢাদের বিরোধীতাকেও দায়ী করেন। এ প্রসঙ্গে মনিরুজ্জামান বলেন, "এর সঙ্গে যুক্ত ছিল রক্ষণশীল মোলণ্ঢা-মৌলবীদের ইংরেজি শিক্ষাবিরোধী প্রচারণা। এই শিক্ষাকে হারাম বলে তারা এর বিরুদ্ধে 'ঘোর আন্দোলন'ও শুরু করে ছিলেন।"[১০] তবে কেউ কেউ আবার ভিন্ন কারণকেও দায়ী করেন। যেমন, সৈয়দ আবদুল আগফার 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় প্রেরিত একটি চিঠিতে উলেণ্ঢখ করেন–

> ১. রাজভাষা শিক্ষা করাকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্যরূপ কুসংস্কার মনে করা, ২. অভিভাবকের অবহেলো ও অদূরদর্শিতা, ৩. অর্থের অনটন, ৪. রাজভাষা শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মকার্যে অনিচ্ছা ও বীতশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, ৫. হিন্দুদিগের বিদ্বেষ, ৬. শ্রমবিমুখতা, ৭. শিক্ষা বিভাগে মুসলমান কর্মচারীর স্বল্পতা, ৮. কর্মচারী নিয়োগের ভার হিন্দুদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকা।[১১]

তৎকালীন মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যেসকল বিষয় অন্তরায় ছিল খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা সুন্দরভাবে তা তুলে ধরেন এবং প্রতিকারের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে এই কারণগুলো হলো[১২]- ১. সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির দারিদ্র্যতা, ২. ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থার অভাব, ৩. ভাষার বাহুল্য, ৪. স্কুল, কলেজের শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা-স্বল্পতা, ৫. স্কুল এবং কলেজ হোস্টেলের ব্যয়াধিক্য, ৬. শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদে মুসলিমদের অপ্রাচুর্য্য, ৭. বিশ্ববিদ্যালয় এবং তদ্সংলগ্ন প্রতিষ্ঠানাদিতে মুসলিম প্রতিনিধির অভাব, ৮. ডিষ্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে উপযুক্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি গ্রহণের অভাব। এই কারণগুলোকে আবার ড. এস. এম. লুৎফর রহমান পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। যথা[১৩]- ১. মুসলিম সমাজের দারিদ্র্যতা, ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিকূল পরিবেশ, ৩. শিক্ষা বিভাগ ও প্রশাসনে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব, ৪. শিক্ষানীতির একদেশদর্শিতা ও ৫. সরকারী প্রশাসনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক অনুকূল্যের অভাব। তবে দরিদ্রতাই শিক্ষার মূল অন্তরায়। দারিদ্র্যতা দূরীকরণ ব্যতীত শিক্ষা বিস্তার অসম্ভব। কাজেই, আহ্ছানউলণ্ঢা মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে প্রধানতম অন্তরায় দরিদ্রতা দূরীকরণের জন্য- অধিকহারে সরকারী সাহায্য, বৃত্তি, স্বল্পহারে বেতন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আবার অনেকের পক্ষে শিক্ষাভার গ্রহণ করা সম্ভব

হলেও মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় বোর্ডিং এর ব্যবস্থা ছিল না। ড. এস.এম.লুৎফর রহমান বলেন, "...শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হলেও দূরবর্তী স্থানে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁই এর অভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ মুসলমান ছাত্ররা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে সমর্থ হ'ত না।"[১৪] আবার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন, বিষয় নির্বাচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ ও পরিদর্শকবৃন্দ নিরপেক্ষ আচরণ করতেন না। যার কারণে তিনি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিমদের অংশীদায়িত্ব থাকার প্রয়োজন বোধ করেন। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও শিক্ষা, কলেজ পর্যায় পরিবেশ ও পরিচালন ব্যবস্থা-সর্বত্রই মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে সাম্প্রদায়িক প্রতিকূলতা বিরাজমান, এটি কেবল মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সত্য ছিল তা নয়, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যও তা সত্য ছিল। এই সমস্যাগুলো তাঁকে গভীর ভাবে ব্যথিত করে এবং তা দূরীকরণের জন্য তিনি সর্বান্তকরণ চেষ্টা করেন। শিক্ষা বিস্তারে কোনো সম্প্রদায়ই যেন উপেক্ষিত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখেন। উক্ত সময়ে শিক্ষা-নীতি দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল; একটি প্রাচ্য ধারার শিক্ষা-নীতি এবং অন্যটি পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষা-নীতি। এ প্রসঙ্গে ড. এস.এম. লুৎফর রহমান বলেন–

> প্রাচ্য ধারার শিক্ষা-নীতি দ্বারা মক্তব, জুনিয়র মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসা পরিচালিত হ'ত: আর পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষা-নীতি দ্বারা পরিচালিত হ'ত পাঠশালা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ দু'টি ধারায় পরিচালিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে প্রাচ্য ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য ধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তোলা হয়নি। প্রথম ধারাটির উন্নয়ন সাধন ও সেটিকে যুগোপযোগী ক'রে গড়ে তোলাও হয়নি। তাই এধারা ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং পশ্চাৎপদ।[১৫]

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা দুর্বল ও পশ্চাৎপদ শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেন। তিনি যখন ১৯০৪ সালে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টার, তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩০ বছর। উক্ত সময়ে রাজশাহী সরকারী কলেজ সংলগ্ন 'ফুলার হোস্টেল' নির্মাণে উলেণ্ঢখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলেন–

> আমি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রাজশাহীতে যোগদান করি। সেখানে নাটোর মহারাজার পক্ষ হইতে একটী হিন্দু ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু মোছলমান ছাত্রদিগের জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই আমি রাজশাহী জেলার স্থানে স্থানে জন-সাধারণকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষার প্রস্তাব করি। কত দিবা, কত রাত্রি বৃক্ষতলে একাকী যাপন করিতে হইয়াছে।[১৬]

সে সময় তাঁর আহ্বানে রাজশাহী শহরের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং সহৃদ হোস্টেল নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে বি.ফুলার (ছোটলাট) হোস্টেল নির্মাণে অর্থ অনুমোদন করেন। বি.ফুলারের স্মৃতি রক্ষার্থে নামকরণ হয় 'ফুলার হোষ্টেল'। বর্তমানে 'ফুলার হোষ্টেল সর্ব্বজন-বিদিত ও রাজশাহীর একটী গৌরব।'[১৭] উলেণ্ঢখ্য, উক্ত ছাত্রাবাসটি কলেজিয়েট স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট হলেও পরে রাজশাহী কলেজের ছাত্রদের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। আহ্ছানউলণ্ঢা চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থানকালে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেণী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিলণ্ঢা প্রভৃতি স্থানে মধ্য ও উচ্চ ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য মনোনীত হয়ে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত তাতে নানা সংস্কারণের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি বলেন–

> আমি পাঁচ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার ক্ষুদ্র শক্তি মোছলেম শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ছিল এবং উহার ফলে বর্ত্তমান শিক্ষা বিভাগে বহু মোছলেম শিক্ষক ও পরিদর্শন কর্ম্মচারী দৃষ্টিগোচর হইতেছে।...জীবনের শেষ ভাগটুকু যদি মানব-জগতের সেবা করিবার সুযোগ পাই, তবে স্বীয় জীবনকে ধন্য মনে করিব।[১৮]

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালনে মুসলিম শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতি হয়। দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের জেলাসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী। নিম্নের সারণী থেকেই বৃদ্ধির হার স্পষ্টভাবে বুঝা যায়[১৯]-

জেলা	১৯২১-২২		১৯২৪-২৫		বৃদ্ধি
	মোট ছাত্র	মুসলিম (শতকরা)	মোট ছাত্র	মুসলিম (শতকরা)	
ঢাকা	৬৯,২০৩	২২.৫	৮২,৪১৭	২৬.১	৪.৪
চট্টগ্রাম	৫৭,৭৩৭	৩২.৮	৮১,৬৮৬	৪৬.৪	১৩.৬
নোয়াখালী	৫৪,৭৭৮	৩১.৯	৭০,৭৬৫	৪১.২	৯.৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২২৫	২০.৭	৩২৪	২৯.২	৮.৫
যশোর	৩১,৩৩১	১৯.৬	৩২,৫৭২	২০.৪	০.৮
পাবনা	৩৬,০৫২	১২.৬	৩৫,৫৪৪	১২.৫	০.১
বর্ধমান	১২,০০৯	১৬.৭	১৩,২৯৪	১৮.৫	১.৭
মুর্শিদাবাদ	১৬,২৫৭	১৬.০০	১৬,৯৯৬	১৬.৭	০.৭
সূত্রঃ বেঙ্গল ডিষ্ট্রিট গেজেটিয়ার, বি. ভলিউম. (স্ট্যাটিসটিক্স) জেলাঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মুশিদাবাদ ১৯২১-২২, ১৯২৪-২৫					

তাঁর প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম বিভাগের সকল জেলাতেই মুসলিম ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার এই উন্নতি পরবর্তী বছরেও চলতে থাকে। এই প্রসঙ্গে ড. ইমরান হোসেন বলেন, "অন্যান্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও এই সময় এই জেলায় উলেণ্ঢখযোগ্য সংখ্যক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধারা পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকে।"[২০]

মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায়গুলো দূর করার জন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা যে সকল সংস্কারমূলক কাজ করেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. তিনিই প্রথম পাবলিক পরীক্ষার খাতায় রোল নাম্বার পদ্ধতি প্রচলন করেন। পূর্বে পাবলিক পরীক্ষার খাতায় নাম লেখা থাকতো। ফলে শিক্ষার্থীদের সুবিধার চেয়ে অসুবিধা হতো বেশি। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোন থেকে অনেক শিক্ষার্থী কম নাম্বার পেয়েছেন এমন অভিযোগ সে সময় ছিল।

২. উক্ত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মাদ্রাসা থেকে পাশ করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কোনো সুযোগ ছিল না। তাঁর প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন–

> ক্রমে উক্ত মাদ্রাসাদ্বয়ের Standard যথোচিত উন্নীত করা হইল। বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। তদবধি বহু মাদ্রাসার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সুযোগ পাইয়াছে। কেবল আরবি পারসী বিষয়ে নহে, ইংরেজি, অঙ্ক ও দর্শন- সকল বিষয়েই হিন্দু ছাত্রদিগের সহিত মাদ্রাসার মোছলেম ছাত্রগণ সমতুল্যভাবে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতেছে।[২১]

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনেও তাঁর অবদান লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর একটি উক্তি থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি বলেন–

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল সিনেটে উপস্থিত হইলে দারুণ বিরোধের সৃষ্টি হয়, পরে উহা বিবেচনার জন্য একটী স্পেশাল কমিটী গঠিত হয়। উহার মধ্যে আমি একজন মেম্বর ছিলাম এবং যতদূর সাধ্য উহার আবশ্যকতা সমর্থন করিয়াছিলাম।[২২]

৪. সকল স্কুল, কলেজে মৌলবির পদ ছিল না, যার কারণে তিনি সর্বত্রই মৌলবীর পদ সৃষ্ট করেন এবং বেতন বৈষম্য দূরীভূত করেন। এভাবে তিনি বহু মুসলিমদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিও করেন।

৫. কলিকাতায় মুসলিম ছাত্রদের স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল দীর্ঘ দিনের এবং তা বাস্তবায়নে বিলম্ব হতে থাকে। তিনি তা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলিম ছাত্রদের স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যৌক্তিকতা দেখিয়ে তাঁর দপ্তর থেকে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে বলা হয়-

> Proposal for the establishment of such a College in Calcutta was first made in 1881 and intermediate classes were opened in Calcutta Madrasa in 1883. The classes were however abolished in 1919 and since then a certain number of Master students have been allowed to read in the Presidency College for the payment of reduced fees.
> On account of the increase of Muslim students Govt. expressed desire to establish in 1913 and again in 1914, Calcutta University Commission also recommended for such College.[23]
> তাঁর বহু চেষ্টার পর প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিয়া কলেজ। "কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মি. হারলি এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন।"[২৪]

৬. তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসলিম হাইস্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক মুসলিম শিক্ষকেরও কর্মসংস্থান হয়। তাঁর ভাষায়- "গভর্ণমেন্ট মোছলেম শিক্ষার ভার আমারই হস্তে ন্যস্ত করেন। উহার ফলে বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মোছলেম হাইস্কুল ও কলেজ আমারই তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়।"[২৫] এছাড়াও তৎকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠিত বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, মোছলেম ইনস্টিটিউট প্রভৃতি তাঁর অবদানের সাক্ষ্য বহন করে আজও।

৭. তিনি মুসলিম লেখকদের উৎসাহ যোগান। অধিকন্তু, "তৎকালীন মখদুমী লাইব্রেরী, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ইসলামিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা এবং টিকে থাকার ক্ষেত্রে... খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার অবদান অনস্বীকার্য।"[২৬]

৮. শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন কমিটিতে মুসলিমদের সংখ্যা তেমন না থাকায়, তিনি মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। যেমন, টেকস্ট বুক কমিটি, পরীক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক, স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি প্রভৃতিতে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন এবং তাতে সফলও হয়েছিলেন।

৯. মুসলিম ছাত্রদের জন্য তিনি অধিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং নতুন মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করেন। তিনি বলেন, "New Scheme মাদ্রাসার সৃষ্টি হইল এবং আরবি শিক্ষার মধ্যস্থতায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হইল।"[২৭]

আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে অন্তরায়গুলো দূর করে তিনি অধোগতি মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে– তিনি কেবল মুসলিমদের শিক্ষার বিস্তারে কাজ করেছেন? তিনি

শিক্ষা বিস্তারে একদেশদর্শী নীতির বির"দ্ধাচারণ করেও যুক্ত থেকেছেন কেন? প্রসঙ্গে বলা যায়, মুসলিম সমাজ আধুনিক শিক্ষাকে দ্র"ত গ্রহণ না করায় যে অন্ধকারের দিকে ধাবমান হচ্ছিল, তা থেকে রক্ষা করে তিনি উভয় সম্প্রদায়কে এক সারিতে নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। পিটার সিঙ্গার বলেন, "কোন জাতি বা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হলে– ক্ষতিগ্রস্ত সকলের স্বার্থ বিবেচনায় আনতে হবে। সমতা গঠনে দীর্ঘ অবস্থান কমানোর একটিই পথ, বিপরীত বৈষম্য নীতি (the reverse disrcimination principle) অনুসরণ করা। এই নীতিটি সুবিধাবঞ্চিত দল বা সম্প্রদায়ের সদস্যকে প্রাধিকারভিত্তিক ট্রিটমেন্ট অনুমোদন করে।"[২৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢাও তেমনটি করেছিলেন। মুসলিম সমাজের অজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে তিনি বেদনার সাথে স্মরণ করেন এবং তাদের সমকক্ষ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, "বড়ই পরিতাপের বিষয় যে একদিন যে জাতি জ্ঞানরাজ্যে জগতের আদর্শ ছিল তাহারাই আজ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। ...হিন্দু এবং মোছলমান শিক্ষা বিষয়ে সমকক্ষ না হইলে বঙ্গবাসী জীবনের কোনো ক্ষেত্রে সম্যক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।"[২৯]

শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল অর্থ সংগ্রহ নয়, চরিত্রগঠনও প্রয়োজন। আহ্ছানউলণ্ঢা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, "শিক্ষার দুইটী উদ্দেশ্য-চরিত্রগঠন ও জীবিকা সংগ্রহ। প্রথমটিকে আমি মুখ্য ও দ্বিতীয়টিকে গৌণ উদ্দেশ্য মনে করি। মানুষ না হইতে পারিলে জীবিকা-সংগ্রহের চেষ্টা বৃথা।"[৩০] শিক্ষা মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি চরিত্রকে গঠন করলেই সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায়। চরিত্রকে গঠন না করে জীবিকা অর্জন বৃথা। আহ্ছানউলণ্ঢা মুসলিমদের সকল অজ্ঞতা, কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে আহ্বান করেন। তিনি বলেন–

> আমরা দরিদ্র, অশিক্ষিত ও আত্মসম্মানবর্জ্জিত, তাই সকলেরই ঘৃণ্য। দোষ অপরের নহে, দোষ আমাদের। যে আপনাকে সাহায্য করিতে পারে, সেই অপরের সাহায্য পাইবার উপযোগী। তাই বলি, যদি সমাজকে উন্নত করিতে হয়, যদি শাসন-নীতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, যদি অন্য জাতির সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে সমকক্ষতা লাভ করিতে হয় তবে ভিক্ষা ছাড়, অলসতা ত্যাগ কর, চরিত্র গঠন কর; মানব নামের বাচ্য হও![৩১]

তাঁর এই ধরনের আহ্বানে মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তিনি ঘুমিয়ে থাকা মুসলিম সমাজকে উদ্দেশ্য করে আরও অনেক কথা বলেন, যাতে করে তারা উপেক্ষিত, ঘৃণ্য অপবাদ থেকে মুক্ত হতে পারে, নিজের জড়তাকে দূর করে সকল সম্প্রদায়ের ভালবাসা পেতে পারে। আর কতদিন মুসলিম সমাজ অজ্ঞতার ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবে। তাই তাঁকে আরও বলতে শুনি-

> তাই বলি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, সংসার ক্ষেত্রে সকলেই অগ্রসর; কেবল তোমরা বঙ্গীয় মুসলমান সকলের পশ্চাৎপদ। তোমাদের জড়তা দেখিয়া তোমাদের শুভানুধ্যায়ী হিন্দু ভ্রাতৃগণ দু:খিত ও ব্যথিত। অগ্রসর হইলেই তাঁহাদের সাহায্য পাইবে, সহানুভূতি পাইবে, সম্মান পাইবে। আর নিদ্রিত থাকিলে উপেক্ষিত হইবে, ঘৃণিত হইবে; অবশেষে স্বীয় অস্তিত্বটুকুও হারাইবে![৩২]

সকল সম্প্রদায়ের সমভাবে উন্নতির উপর নির্ভর করছে জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি– এটিই ছিল আহ্ছানউলণ্ঢার ঐকান্তিক লক্ষ্য। সমাজের কোন একটি অংশের অগ্রগতি না হলে যেমন বলা যায় না সমগ্র সমাজের অগ্রগতি হয়েছে, ঠিক তেমনি মুসলিম সমাজের অগ্রগতি ব্যতীত বলা যায় না সমগ্র ভারতবর্ষের অগ্রগতি হয়েছে। সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমেই যেমন একটি দেহ সুস্থ থাকতে পারে,

তেমনি একটি দেশের সমগ্র সম্প্রদায়ের সুষম বিকাশের মাধ্যমেই জাতীয় উন্নতি সম্ভব। কাজেই শিক্ষার জন্য উভয় সম্প্রদায়েরই উন্নতি প্রয়োজন। তিনি শিক্ষা বিভাগে অবস্থান করে যেখানেই সমস্যা মনে করেছেন শিক্ষা বিস্তারের পথে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই সমাধান করার চেষ্টা করেছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা শিক্ষা বিভাগের সংস্কার সাধন করেই ক্ষান্ত হননি; শিক্ষানীতিও দাঁড় করেছিলেন। আজ থেকে প্রায় অনেক বছর পূর্বে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন তা কেবল তাঁর মতো একজন শিক্ষা সংস্কারক ও মহান দার্শনিকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে তুলনা করে বলেন, "ইউরোপ বা আমেরিকায় যেরূপ সুশিক্ষা হয়, আমাদের দেশে সেইরূপ হয় না। ঐসকল দেশে সহস্র সহস্র শিক্ষা প্রণালীর পুস্তক থাকা সত্ত্বেও নিত্য, নূতন নূতন পুস্তক লিখিত ও পঠিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক অতি বিরল; যাহা আছে, তাহাই বা কয়জনে পড়িয়া থাকে?"[৩৩] বর্তমান সমাজেও উক্ত বিষয় পরিলক্ষিত হয়। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, আমাদের দেশে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য একমাত্র অর্থ উপার্জন নয়। যদি ধরা হয়, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন, তাহলে প্রশ্ন উঠে, অর্থ উপার্জন দ্বারাই কী জীবনের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব?– তা মনে হয় সঠিক নয়; এর সঙ্গে আত্মার উন্নতিও প্রয়োজন। আত্মিক উন্নতি ছাড়া প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। আত্মিক উন্নতি মানুষকে সকল প্রকার অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। উচ্চশিক্ষা লাভ করার পরে, এই শিক্ষা যদি কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনই হয়, তা হলে সমাজে অনাচারের কোনো শেষ থাকবে না, জাতি হবে ধ্বংস। তিনি সংশয় প্রকাশ করেন, সকল শিক্ষার্থীই প্রকৃত মানুষ হয় কিনা। তিনি বলেন, "কেবল অর্থকরী বিদ্যা দ্বারা জীবন-সমস্যার সমাধান হয় না। আধ্যাত্মিক শিক্ষার আবশ্যক। কেবল অর্থ মানুষকে উন্নত করিতে পারে না। আত্মার উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। মানবতাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইতেছে বহু লোক, কিন্তু মানুষ তৈরি হইতেছে কয়টী?"[৩৪] প্রকৃত মানুষ ব্যতীত দেশ, জাতি কোনোটিই উন্নতি লাভ করতে পারবে না। মানুষ শরীর, মন এবং আত্মা নিয়ে গঠিত। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজন ব্যায়মের এবং আত্মার সুস্থ্যতার জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক শিক্ষার। কিন্তু বাস্তবে আমরা আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি একেবারেই উদাসীন। তিনি বলেন, "শরীরের আয়ু সীমাবদ্ধ, কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। শাশ্বত কাল যে আত্মার প্রসার, তার শিক্ষার জন্য আমরা একদম উদাসীন। যে শিক্ষার দ্বারা শরীর মন পুষ্ঠ হয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।"[৩৫] কাজেই বলা যায়, শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন হতে হবে যাতে মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারে, সৎচরিত্রগঠন করতে পারে, আত্মার উন্নতি সাধন করতে পারে। তিনি বলেন–

> মনুষ্যত্ব লাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক এই ত্রিবিধ বৃত্তির সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। শরীর মন ও আত্মা প্রত্যেকেরই পুষ্টিসাধন হইলে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য হয়। উদ্ভিজ্জ বীজ যেমন বায়ু, জল ও সূর্য্যতাপ সাহায্যে ফলবান বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, শিশুও সেইরূপ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাবলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে।[৩৬]

শুধু শিক্ষা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে নয়, শিক্ষার মধ্য দিয়েই একজন মানুষ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে পূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠে। শিক্ষার মাধ্যমেই সকল সংস্কার দূরীভূত হয়। এছাড়াও মানুষের মধ্যে যে মন্দ গুণগুলো রয়েছে, সেগুলো দূরীভূত করে উদার মানুষ গড়ে তোলে

শিক্ষা। আহ্ছানউলণ্ঢার প্রত্যাশা শিক্ষা অবশ্যই মানুষকে সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত রাখবে, সকল প্রকার হীনমনতা থেকে মুক্ত রাখবে, ইন্দ্রিয়গুলোকে বশীভূত করে বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত করবে। তাই তিনি বলেন, "শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও চৈতন্যের বিকাশ হয় এবং ইহা কুসংস্কারকে বহুল অংশে বিলুপ্ত করে এবং হীন, কলুষিতচিত্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিকে অমানুষিকতা হইতে উদ্ধার করে।"[৩৭] শিক্ষা হলো শিশুর সকল রকম সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ; শিশুর দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক জীবনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সাধন করাই হলো শিক্ষা। তিনি শিক্ষামূলক কার্যক্রমে ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার মিলন ঘটিয়েছেন। আত্মোন্নতির তাগিত থেকেই তিনি রাজনীতির পথ না ধরে, সত্যিকার শিক্ষাদীক্ষার উদার পথ ধরেই কর্ম সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি একজন সত্যিকার সমাজ-শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা 'টীচাসর্ ম্যানুয়েল' নামক গ্রন্থে শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণে মনুষ্যত্ব লাভ এবং তা লাভের জন্য শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। এই ত্রিবিধ বৃত্তির সাধন হলেই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা হয়ে থাকে, নচেৎ নয়। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে আত্মোপলব্ধির জন্ম নেয়, গড়ে উঠে আত্মবিশ্বাসী মানুষ। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা শুর" হয় পরিবার বা গৃহ থেকেই। প্রথমে গৃহে পিতা-মাতার কাছ থেকে শিশু শিক্ষা গ্রহণ করে। শিশুদের সুকোমল মনসপটে সুশিক্ষার বীজ রোপন করা, পিতা, মাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য। শিশুদের যেরূপ শিক্ষা দেয়া হয়, তারা সেরূপ শিক্ষাই গ্রহণ করে এবং সেই শিক্ষাই জীবনে প্রয়োগ করে। তাদের শুভ-অশুভ কর্ম অনুসারে, জগতের শুভ-অশুভ বা উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। শিশুর শিক্ষা শুর" হয় পিতা-মাতার নিকট থেকে এবং শেষ হয় শিক্ষকের নিকট থেকে। গৃহের পর সমাজও শিক্ষার সহায়তা করে থাকে। খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার মতে, 'যে সমাজ যত উন্নত, সে সমাজ শিক্ষার তত অনুকূল।'[৩৮] তিনি শিক্ষা অর্জনের জন্য তিনটি শিক্ষাস্থলের কথা বলেন যথা, গৃহ, বিদ্যালয় এবং ধর্মশালা। শিশুর চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রভাব বিস্তার করে গৃহ-শিক্ষা। তবে গৃহ-শিক্ষা যথেষ্ট নয়। এরপর শিশুর শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়ের। তৎকালীন সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে যে শিক্ষা দেয়া হয় তা কেবল অর্থ উপার্জনের সহায়ক বলে তিনি মনে করেন। আর নৈতিক শিক্ষার পূর্ণতার জন্য তিনি ধর্মভাবকে একান্ত অনুকূল বলেন। কেননা পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই কল্যাণের কথা বলে, চারিত্রিক বা সৎগুণাবলী অর্জনের কথা বলে।

সাধারণত অনেকেই পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের আশায় স্মৃতিশক্তির প্রখরতাকে গুর"ত্ব প্রদান করেন। যার সঙ্গে মানসিক শক্তির কোনো বিকাশ ঘটে না। জ্ঞান হতে হলে কেবল স্মৃতি শক্তির পুষ্টিসাধন করলেই হবে না, আবার পরীক্ষায় ভাল ফলাফল লাভ করলেই হবে না– মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, "যে জ্ঞান মানসিক শক্তির বিকাশ করে, সেই প্রকৃত জ্ঞান।"[৩৯] উলেণ্ঢখ্য, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর সৃজনশীল শিক্ষাকে তথা মানসিক শক্তির বিকাশকে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে শিক্ষককেও সঠিক শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে অবগত হতে হবে। শিক্ষার্থী পথিকস্বরূপ, যাকে পথ দেখিয়ে দিবে শিক্ষক। পথিক গন্তব্যস্থান ও পথ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, কিন্তু পথপদর্শক উভয় ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ। পথপ্রদর্শক গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য সহজ সুগমপথ অবলম্বন করে থাকেন ও পথিককে অনুসরণ করতে বলেন। শিক্ষককে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো এরূপে শিক্ষা দিতে হইবে যে, বালকের আত্মাবলম্বন শক্তি পূর্ণভাবে প্রদীপ্ত হয়।'[৪০] এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষকের তিনটি কর্তব্য উলেণ্ঢখ করেন। যথা:

> ১. সুশিক্ষা-শিক্ষার্থীর মনোবৃত্তিনিচয়ের যুগপৎ পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন সাধন, ২. সুব্যবস্থা- আদর্শ নক্সা অনুযায়ী স্কুলগৃহ সংগঠন, শিক্ষা উপযোগী আসবাব ও উপকরণাদি সংগ্রহকরণ, লাইব্রেরী, মিউজিয়ম ও ছাত্রনিবাস সুনিয়মে পরিচালন, সময় নির্দ্দেশক তালিকা প্রস্তুতকরণ, রেজিষ্টারগুলো যথানিয়মে পূরণকরণ ও স্কুলগৃহ ও প্রাঙ্গণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সংসাধন, ৩. সুশাসন- কিসে বালকদিগের সৎকার্য্যের প্রতি প্রবৃত্তি, সত্যের প্রতি অনুরাগ ও জ্ঞানের জন্য স্পৃহা জন্মে, তৎপ্রতি দৃষ্টিকরণ।[৪১]

শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য সুশিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির পরিপুষ্টি সাধন করা। শিশুর প্রতি লক্ষ্য রেখেই অর্থাৎ তার বাহ্যজ্ঞান, ধারণশক্তি প্রভৃতি বিবেচনা করেই ক্রমশ: অগ্রসর হতে হবে। খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা বলেন, "সহজ হইতে জটিল ও জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বিষয়ে অগ্রসর হওয়া সুশিক্ষার অন্যতম প্রণালী। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান হইতে ক্রমে ইন্দ্রিয়ের অলব্ধ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে হইবে।"[৪২]

শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে আসে সুব্যবস্থা অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ একটি আদর্শ নক্সা অনুযায়ী করতে হবে এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য একটি লাইব্রেরী প্রতিটি স্কুলের জন্য আবশ্যক তিনি বলেন, যাতে ছাত্র শিক্ষক উভয়েরই পুস্তক থাকবে। আবার শিক্ষক কেবল সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থাপক হলেই চলবে না, তাকে সুশাসকও হতে হবে। "সুশাসন গুণে ছাত্রগণ নিয়মানুবর্ত্তী, মনোযোগী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় এবং বিদ্যালয়ের বিধান ও শৃঙ্খলা সাধিত হয়।"[৪৩] শিক্ষার্থীকে তার পাঠ সুন্দরভাবে তৈরির করার জন্য প্রশংসা করতে হবে, যাতে তার আগ্রহ আরও বাড়তে থাকে, কিন্তু কোনো শিক্ষার্থী ভাল না করলে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। কোন প্রকারের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না যেমন, মাথায় প্রহার, কানটানা কিংবা চুলটানা, চড় মারা, টেবিলের নীচে মাথা দেওয়া প্রভৃতি এছাড়াও তাকে অকথ্য ভাষায় কথা বলা এগুলো নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। তাই একজন শিক্ষককে কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, ভদ্রতা, অমায়িকতা, গাম্ভীর্য্য, দয়া প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন। আসলে শিক্ষককে আদর্শ মানুষ হওয়া উচিত, যা সকলেরই অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি বলেন, " ...তাঁহার বিদ্যা ও চরিত্র সকলের অনুকরণীয় হইবে। অনেক শিক্ষক শাসন সংরক্ষণ জন্য চীৎকার করিয়া থাকেন, ইহা দূষণীয়। শিক্ষকের ভ্রূভঙ্গি ছাত্রের মনে ভয়ের সঞ্চার করিবে ও ঈষৎ হাস্য পুরস্কারস্থানীয় হইবে।"[৪৪]

শিশুর মানসিক বৃত্তিকে বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে শিশুশ্রম। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই শিশুশ্রম আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হলেও বাস্তবে এখনও লক্ষ্য করা যায়। শিশু অসংখ্য সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অনেক সম্ভাবনাই বিলুপ্ত হয় সঠিক পথ পরিক্রমার অভাবে। একমাত্র শিক্ষাই হলো সেই পথ পরিক্রমার আদর্শ সোপান। আদর্শ শিশু শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত, তিনি 'টীচারস্ ম্যানুয়েল' নামকগ্রন্থের কিন্ডারগার্টেন অধ্যায়ে আলোচনা করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুর শিক্ষার উপর গুর"ত্বারোপ করেন। আমাদের দেশে বেশ কিছু বছর পূর্বে শিশুর শিক্ষাদানের জন্য কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি প্রচলন হয়ে আসছে। প্রথমদিকে এটি শহর কেন্দ্রিক হলেও, তা এখন গ্রামে-গঞ্জেও লক্ষ্য করা যায়। তবে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করা হয় এবং

যে পরিবেশে শিক্ষা দেয়া হয়- তা যথোপযুক্ত কিনা? তা ভাবার বিষয়। আমাদের দেশে আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার নিয়ম-নীতি, শিক্ষকের যোগ্যতা, শিক্ষা দানের পরিবেশ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা হলেন জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবল (১৭৮২-১৮৫২)। তিনি ১৮৩৭ সালে পরীক্ষামূলকভাবে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। খেলাধুলা, গান প্রভৃতির মাধ্যমে এখানে শিশুদের শিক্ষাদান করা হয়। ১৮৪০ সালে তিনি বিদ্যালয়টির নাম দেন 'কিন্ডারগার্টেন'। তাঁর মতে, শিক্ষার লক্ষ্য বিশ্বজগতের ঐক্য উপলব্ধিতে সহায়তা করা এবং শিশুর সম্ভাবনার বিকাশে সহায়তা করা। তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিই কিন্ডারগার্টেন নামে পরিচিত। এর অর্থ হলো শিশু উদ্যান। বিদ্যালয় হলো উদ্যান স্বরূপ। "শিশুরা হলো সেই উদ্যানের চারাগাছ এবং শিক্ষক হলেন তার মালী। শিক্ষার দ্বারা শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের চেষ্টা করা হয়। ফ্রয়েবলের মতে শিক্ষা বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষণ-পদ্ধতিতে শারীরিক শাস্তি ও শাসন ইত্যাদির স্থান গৌণ হওয়া উচিত।"[৪৫] শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে স্বত:স্ফূর্ত আনন্দের মধ্য দিয়ে; তবে এটি সবসময় দেখা যায় না। স্বাভাবিকভাবে এটি সক্রিয়। একেই তিনি আত্ম-সক্রিয়তা বলেছেন। এই আত্ম-সক্রিয়তা শিশুর প্রকাশ হয় খেলার মাধ্যমেই। তাইতো তিনি শিশুকে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দানের কথা বলেন। ফ্রয়েবল শিশুর শিক্ষা দানের জন্য প্রকৃতির সাহায্যে শিক্ষা দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আবার পেস্তালাৎসীর মত বস্তুভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি এবং উপহার ও বৃত্তি বা হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো- ছড়া ও গানের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া। দুই ধরনের গানের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হতো, যথা; মায়ের গান ও খেলার গান। গানের উপযোগিতা হলো- ছোট শিশুর জন্য রূপ কথার গান- এর মাধ্যমে কল্পনা শক্তিকে জাগ্রত করে, নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী উপদেশমূলক গান প্রভৃতি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা উপলব্ধি করেন যে, শিশু, কুমার ও যুবকের শিক্ষার বিষয়-প্রণালী এক হতে পারে না। শিশুদের জন্য কিন্ডারগার্টেন উপযোগী। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই শিশুর মানসিক শক্তিগুলোর বিকাশ ঘটানো সম্ভব। তিনি বলেন, "...শিশুর শিক্ষা, কুমারের শিক্ষা ও যুবকের শিক্ষার বিষয় ও প্রণালী কখনও একরূপ হইতে পারে না। শিশুতে মানসিক শক্তিগুলো কেবল বিকাশোন্মুখ, কুমারে বিকাশপ্রাপ্ত ও যুবকে পরিপুষ্ট। অতএব ইহাদের জ্ঞানের প্রসারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা আবশ্যক।...কিন্ডারগার্টেন শিশু শিক্ষার প্রণালী বিশেষ।"[৪৬]

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির মাধ্যমেই একজন শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন সম্ভব। কিন্ডারগার্টেন প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি মনে করেন শিশুরা উদ্যানে যেরূপ আনন্দে ভ্রমণ করে, সেরূপ কিন্ডারগার্টেন স্কুলেও ব্যবস্থা থাকবে। ক্রীড়ার ছলেই শিশুরা তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো ধীরে ধীরে শিক্ষা লাভ করবে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকে। খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রণালী যেভাবে দাঁড় করান তা নিম্নরূপ:

১. কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া: তিনি বলেন, শিশুরা সব সময়ই চঞ্চল। এই চঞ্চলতাকে বাধা দিয়ে শিক্ষা দেয়া যায় না। ফ্রয়েবলের মতো তিনিও এই চঞ্চলতাকে আত্ম-সক্রিয় বলেছেন। নানা

প্রকার কার্যের মধ্য দিয়ে চঞ্চলতাকে প্রকৃষ্ট পথে পরিচালিত করাই কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

২. বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা দেয়া: কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে বস্তুর সাথে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। তিনি পেস্তালাৎসী ও ফ্রয়েবলেন মতো বস্তুর সাহায্যে শিশুদের শিক্ষা দেয়ার কথা বলেন।

৩. বর্ণ বা রং এর সাহায্যে শিক্ষা দেয়া: শিশুরা রং বা বর্ণের প্রতি দুর্বল। "সুন্দর সুন্দর রং দেখিলে শিশুগণ বড়ই তুষ্ট হয়। সকল শিশুই সুন্দর সুন্দর রঞ্জিত দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা করে।"[৪৭]

৪. বৃত্তি বা হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া: ফ্রয়েবলের মতো তিনিও বৃত্তি বা হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়াকে গ্রহণ করেছেন।

৫. কল্পনা শক্তি: বিভিন্ন ধরনের গল্প, ক্রিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুদের কল্পনা শক্তিকে জাগরিত করার চেষ্টা করা হয়।

৬. সহানুভূতি: কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে অন্যান্য সকল প্রাণীর প্রতিও সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৭. নীতিবিজ্ঞানের শিক্ষা দেয়: ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার- সময়নিষ্ঠা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। "সুনীতি অর্জ্জন একদিনের কার্য্য নহে। উহা অভ্যাসের ফল। শিশুরা স্বভাবত:ই চঞ্চল ও বিবেচনাশূন্য।"[৪৮] আজকের এই শিশু আগামী দিনে পূর্ণ মানুষে পরিণত হবে। কাজেই তিনি মনে করেন শিশু শিক্ষাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক বিশেষ গুণের অধিকারী হবেন। এক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষকের চেয়ে তিনি মহিলোা শিক্ষককেই শ্রেয় মনে করেন। শিক্ষকের নিম্নলিখিত বিশেষ গুণ[৪৯] থাকা আবশ্যক। যথা; ১. শিশু প্রকৃতিতে অভিজ্ঞতা, ২. ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, ৩. প্রফুলণ্ঢচিত্ততা, ৪. প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ৫. ছাত্রদের ক্রীড়া ও আমোদে যোগদান করিবার প্রবৃত্তি, ৬. ড্রইং, হাতের কাজ, উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যার সাধারণ জ্ঞান, ৭. সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভক্তি। এই গুণগুলো থাকলে একজন শিক্ষক শিশুদের সুন্দরভাবে শিক্ষা দান করতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, "কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে মৌখিক শিক্ষাই প্রধান অবলম্বন। কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া শিশুগণ জ্ঞানলাভ করিবে, ইহা কিন্ডারগার্টেনের উদ্দেশ্য নহে। এই জন্য বস্তুপাঠ ও প্রকৃতি পাঠের ব্যবস্থা।"[৫০] মানব জাতির চরম উৎকর্ষের সোপানই শিশু হৃদয়ে বিদ্যমান। কিন্ডারগার্টেন স্কুল সম্পর্কে তাঁর মত সক্রিয়তা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। বর্তমানেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশন শিক্ষা সংস্কারে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে একটি উক্তি তোলে ধরা হলো-

> ২০০৯ সালের খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা স্বর্ণপদক অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যথাযথই বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা ইতিহাসই নন একাধারে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত। তাঁকে অনুসরণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতকে দেখতে হবে। তাঁর নাম, কাজ ও বিভিন্ন গুণাবলী ধারণ করে আহ্ছানিয়া মিশন যে বহুমুখী কাজ করছে, তা সমাজে বিশেষ অবদান রাখছে।[৫১]

শিক্ষা বিস্তারে তিনি নারী শিক্ষাকেও আদৌ অবহেলোার দৃষ্টিতে দেখেননি। নারীরাও শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে, বিশেষকরে মুসলিম নারীরা। তিনি বিশ্বাস করেন একজন মা সমগ্র জাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। "...একজন সুশিক্ষিত মাতা তাঁর সন্তানকে সুশিক্ষিত করে গোটা জাতির যোগ্য নেতারূপে গড়ে তুলতে পারেন।"[৫২] তৎকালীন সময়ে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলিম সমাজের বিদূষী নারী বলে সমাদৃত ফজিলাতুন্নেছাকে বিলাতে প্রেরণ করেন। ভবিষ্যতে নারীদের উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেন তিনি। তিনি বলেন, "আমি ডিরেক্টর অফিসে থাকিতে প্রস্তাব হইয়াছিল একটী উপযুক্ত মোছলেম মহিলোাকে বৃত্তি দিয়া বিলাতে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠাইতে এবং ট্রেনিং অন্তে ইনস্পেক্টরস বা তত্তুল্য কোনো পদে নিয়োগ করিতে। ভবিষ্যৎ মোছলেম মহিলোাদিগের উচ্চ শিক্ষার উন্নতিকল্পে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।"[৫৩] উলেণ্ঢখ্য যে, ফজিলাতুন্নেছা ছিলেন বেথুন কলেজের অংক শাস্ত্রের অধ্যাপক, পরে উক্ত কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল এবং ঢাকা ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল।

উপসংহার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-এর দুটি চরিত্রের সমন্বয় সাধিত হয়েছে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার চরিত্রে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অবস্থান করে শিক্ষার সংস্কার করেন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। আর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটি আদর্শ প্রচার করেছেন, জীবের সেবা প্রদান করেছেন, কিন্তু কোনো ধর্ম প্রচার করেননি। ঠিক খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢাও কোনো ধর্ম প্রচার করেন নি, এক আদর্শ প্রচার করেছেন, স্রষ্টার সকল সৃষ্টের সেবা করে গেছেন। তিনি শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রকৃত শিক্ষার উপর গুর"ত্বারোপ করেছেন। তাঁর প্রত্যাশা পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হয়ে জাতীয় উন্নতি সাধন করবে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকবে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। তিনি সমাজ ও মানুষের কল্যাণ চিন্তায় যে সকল কর্ম পরিচালনা করেছেন তাতে কোনো রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাকে লালন করেননি। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন, "খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা রাজনৈতিক আন্দোলনে না আসিলেও শিক্ষা আন্দোলনের গভীর প্রভাব তাঁহার উপর অক্ষুন্ন থাকিয়া যায়। ...মোসলেম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাহার গভীর আগ্রহ এবং যথাসাধ্য চেষ্টার মাঝেই তাঁহার জীবনের প্রধান প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়।"[৫৪] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে মুসলিম সমাজের অহংকার।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

১ গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা রচনাবলী*, তৃতীয় খ"ত, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: জয় পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ ৫৫।

২ আনোয়ার"ল করীম, *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা ও তাঁর চিন্তাধারা*, ড. গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা: আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ২০০২), পৃ ১৬৭।

৩ শহিদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষা: ঐতিহাসিক পটভূমি; প্রসঙ্গ: শিক্ষা* (ঢাকা: শিক্ষা বার্তা প্রকাশনা, ২০০২), পৃ ২৬-২৭।

৪ মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির ইতিহাস* (ঢাকা: অন্য প্রকাশ, ২০০০), পৃ ১৪।

৫ সৈয়দ মূর্তাজা আলী, *শিক্ষা ক্ষেত্রে দিশারী (প্রবন্ধ)*, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ১৭শ বর্ষ দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ পৌষ ১৩৭৯, পৃ ১০৬-১২২।

৬ আনোয়ার"ল করীম, *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা ও তাঁর চিন্তাধারা*, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা স্মারক গ্রন্থ*, গ্রন্থে সংকলিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৬৮।

৭ গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা রচনাবলী*, সপ্তম খ"ত, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: জয় পাবলিশার্স, ১৯৯৪), পৃ ৩।

৮ খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা রচনাবলী*, সপ্তম খ"ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২।

৯ গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা রচনাবলী*, অষ্টম খ"ত, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ১৯৯৪), সম্পাদকীংশে।

১০ মনির"জ্জামান (সম্পা.) *এছলামাবাদী রচনাবলী* (১ম খ"ত) (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ ৩১৭-৩১৮।

১১ ৮ পোষ ১৩০৬; উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৯), পৃ ১৪।

১২ খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭।

১৩ এস.এম.লুৎফর রহমান, *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পর্কীয় ভাবনা*, ড. গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা স্মারক গ্রন্থ*, গ্রন্থে সংকলিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭৬।

১৪ ঐ, পৃ ১৭৭।

১৫ ঐ, পৃ ১৭৯।

১৬ খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *আমার জীবন-ধারা*, ৮ম সংস্করণ (ঢাকা: আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ২০০৩), পৃ ২১।

১৭ ঐ, পৃ ২২।

১৮ খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *আমার জীবন-ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৭।

১৯ বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, বি. ভলিউম. (স্ট্যাটিসটিক্স) জেলা: ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ ১৯২১-২২, ১৯২৪-২৫।

[২০] ইমরান হোসেন, *বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার (১৮৭৩-১৯৬৫) অবদান: একটি পর্যালোচনা*, ড. গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা স্মারক গ্রন্থ*, গ্রন্থে সংকলিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২২০।

[২১] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *আমার জীবন-ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৪-৯৫।

[২২] ঐ, পৃ ৯৫।

[২৩] Proceeding of the Government of Bengal, Edu. Dept. Sept 1926.

[২৪] গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা স্মারক গ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৪।

[২৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *আমার জীবন-ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৫।

[২৬] গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯।

[২৭] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *আমার জীবন-ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৬।

[২৮] P. Singer, *Practical Ethics,* Second edition (New York : Cambridge University press, 1995), p. 30, 45. (One way of reducing long-standing in equalities, is to follow the principle which is called 'reverse discrimination'. This principle allowes to give preferential treatment to members of disadvantaged groups or communities.)

[২৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭।

[৩০] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য*, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৩।

[৩১] ঐ, পৃ ৩৬।

[৩২] ঐ।

[৩৩] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, টীচারস্ ম্যানুয়েল, *প্রাগুক্ত*, মুখবন্ধ।

[৩৪] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *আমার জীবন-ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৭।

[৩৫] ঐ, পৃ ৯৮।

[৩৬] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, টীচারস্ ম্যানুয়েল, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯।

[৩৭] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯।

[৩৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *টীচারস্ ম্যানুয়েল*, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪২৫।

[৩৯] ঐ, পৃ ৪২৬।

[৪০] ঐ।

[৪১] ঐ, পৃ ৪২৭।

[৪২] ঐ, পৃ ৪২৮।

[৪৩] ঐ, পৃ ৪৪১।

[৪৪] ঐ, পৃ ৪৩০।

[৪৫] সুশীল রায়, *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন*, সপ্তম সংস্করণ (কলিকাতা: সোমা বুক এজেন্সী, ১৩৯১ বাং), পৃ ৬১৮।

[৪৬] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *টীচারস্ ম্যানুয়েল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৯১।

[৪৭] ঐ, পৃ ৫৯২।

[৪৮] ঐ, পৃ ৫৯৩।

[৪৯] ঐ, পৃ ৫৯৫।

[৫০] ঐ, পৃ ৫৯৬।

[৫১] আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ৩২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ ১০।

[৫২] আনোয়ারুল করীম, *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা ও তাঁর চিন্তাধারা*, ড. গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা স্মারক গ্রন্থ*, গ্রন্থে সংকলিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৬৯।

[৫৩] খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা, *আমার জীবন-ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৯।

[৫৪] মাওলানা আকরম খাঁ, *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা*, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পা.), *খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা স্মারক গ্রন্থ*, গ্রন্থে সংকলিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৪-৭৫।